بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ মোতাবেক ১০ তাবুক, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত উমর (রা.)'র খিলাফত কালের কথা উল্লেখ করা হচ্ছিল, সে সময় যেসব যুদ্ধ করা হয়েছে মূলতঃ সেগুলোর উল্লেখ করা হচ্ছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে দামেস্ক অবরোধ কয়েক মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে আর তাঁর (রা.) মৃত্যুবরণের কিয়দকাল পর উক্ত যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লা ভ করে। যেহেতু সেই যুদ্ধ হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে সংঘটিত হয়েছিল তাই যখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করা হবে তখন এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ্। দামেস্ক বিজয়ের পরবর্তী ঘটনাবলী বর্ণনা করছি। দামেস্ক জয় করার পর আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে বিকা'র অভিযানে প্রেরণ করেন। বিকা' হল দামেস্ক, বা'লবাক এবং হিমস্-এর মাঝে অবস্থিত বিস্তৃত এক অঞ্চল যেখানে বহু জনপদ রয়েছে। তিনি (রা.) সেগুলো জয় করেন এবং পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য একটি সেনাদল সম্মুখে প্রেরণ করেন। মেয়সানুন নামক ঝর্ণার উপকণ্ঠে রোমান এবং (মুসলিম) সেনাদলের সংঘর্ষ হয় এবং উভয় দলের মাঝে যুদ্ধ হয়। ঘটনাচক্রে রোমানদের মাঝে সিনান নামক এক ব্যক্তি বৈরুতের উল্টো দিক থেকে এসে মুসলমানদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করতে সক্ষম হয় এবং বহু-সংখ্যক মুসলমানকে শহীদ করে। বৈরুত সিরিয়ার সমুদ্রতীরবর্তী একটি বিখ্যাত শহর। ঐসকল শহীদদের প্রতি আরোপ করে উক্ত ঝর্ণার নাম হয়ে যায় 'আইনুশ শুহাদা' (তথা শহীদদের ঝর্ণা)। আবু উবায়দা (রা.) দামেস্কে ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান'কে নিজ স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে দেন এবং ইয়াযিদ, দেহইয়া বিন খালিফা'কে একটি সেনাদলের সাথে তাদমুর প্রেরণ করেন বিজয়ের পথ সুগম করার জন্য। তাদমুর হল সিরিয়ার একটি প্রাচীন এবং বিখ্যাত শহর যেটি আলেপ্পো থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে অবস্থিত। এখানে যে ইয়াযিদের উল্লেখ করা হচ্ছে তিনি ছিলেন হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর পুত্র।

এমনিভাবে আবু যাহরা কুশায়রী'কে বসনিয়া এবং হাওয়ারান প্রেরণ করেন, কিন্তু সে অঞ্চলের অধিবাসীরা সন্ধিচুক্তি করে ফেলে। বসনিয়া মূলতঃ দামেস্কের নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম। দামেস্কের এক বিস্তৃত অঞ্চলের নাম ফারান যেখানে অনেক জনবসতি এবং কৃষিভূমি ছিল। মুসলমানদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার কারণে শারাহবিল বিন হাসানা (রা.) জর্ডানের রাজধানী তাবারিয়া বাদ দিয়ে দেশের অন্য সকল এলাকা যুদ্ধের মাধ্যমে করায়ত্ব করে নেন এবং তাবারিয়াবাসীরা সন্ধিচুক্তি করে নেয়। হযরত খালিদও সফলতা লাভ করে বিকা' অঞ্চল থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। বা'লবাকের অধিবাসীরা তাঁর সাথে সমঝোতা করে নেয় আর তিনি তাদেরকে সন্ধিচুক্তি লিখে দেন। ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী বা'লবাকও দামেস্ক থেকে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত এক প্রাচীন শহর। এখানে দিনের দূরত্ব বলতে তৎকালীন যুগের সফরের মাধ্যম অর্থাৎ উট বা ঘোড়ায় আরোহণ করে একদিনে অতিক্রান্ত

দূরত্বকে বুঝায়। ফেহেল একটি জনপদের নাম যেটি চৌদ্দ হিজরীতে বিজিত হয়। হযরত আবু উবায়দা (রা.), হযরত উমর (রা.)-এর উদ্দেশ্যে এ মর্মে পত্র লিখেন যে, আমি অবগত হয়েছি, হিরাক্লিয়াস হিম্‌সে অবস্থান করছে আর সেখান থেকে দামেস্কে সৈন্যবাহিনী রওনা করছে। কিন্তু আমি প্রথমে দামেস্ক আক্রমণ করব নাকি ফেহেল- এই সিদ্ধান্ত নেয়া আমার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফেহেলও সিরিয়ার একটি জনপদের নাম। হযরত উমর (রা.) উক্ত পত্রের উত্তরে লেখেন, প্রথমে দামেস্ক আক্রমণ করে বিজয় অর্জন কর, কেননা সেটি সিরিয়ার দুর্গ এবং রাজধানি। পাশাপাশি ফেহেলেও অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ কর যেন তাদেরকে তোমাদের দিকে আসতে না দেয়। যদি দামেস্ক বিজয়ের পূর্বেই ফেহেল বিজয় হয় তাহলে তা উত্তম, অন্যথায় দামেস্ক জয়ের পর কিছু সংখ্যক সেনা সেখানে রেখে সমস্ত নেতাদেরকে নিয়ে তুমি ফেহেলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। যদি আল্লাহ্ তোমাদের হাতে ফেহেল বিজিত করেন তাহলে খালিদ আর তুমি হিমস্ চলে যাবে। আর শারাহবিল ও আমরকে জর্ডান এবং ফিলিস্তিন পাঠিয়ে দিবে। হযরত উমর (রা.)-এর পত্র পাওয়ামাত্রই হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.) সেনাবাহিনীর দশজন কমান্ডারকে, যাদের মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবুল আ'ওয়ার সুলমী, ফেহেল পাঠিয়ে দিলেন এবং স্বয়ং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)সহ দামেস্ক রওনা হয়ে গেলেন। রোমান সেনাবাহিনী যখন মুসলিম সেনাবাহিনীকে নিজেদের দিকে অগ্রসর হতে দেখল তখন নিজেদের চতুর্দিকের জমিতে তাবারিয়া-সাগর ও জর্ডান নদীর পানি ছেড়ে দিল, যার ফলে পুরো এলাকা চোরাবালিবহুল হয়ে গেল আর সেটা অতিক্রম করা দুষ্কর হয়ে পড়ল। যাহোক হিরাক্লিয়াস দামেস্কের সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিল তারাও দামেস্ক পৌঁছতে পারল না। পানি ছেড়ে দেয়ার কারণে সকল পথ রূদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু মুসলমানরা থাকল অবিচল। মুসলমানদের অবিচলতা দেখে খ্রিস্টানরা সন্ধি করতে সম্মত হল। আর আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে দূত হিসেবে কাউকে পাঠানোর অনুরোধ করল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.)-কে দূত হিসেবে প্রেরণ করলেন। হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) তাদের সামনে ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরলেন। কিন্তু শত্রুরা তা গ্রহণ করে নি। অন্যান্য বিষয়ের সাথে রোমানরা হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.)-কে প্রস্তাব দিল যে আমরা তোমাদের বলকা এবং জর্ডানের সাথে তোমাদের ভূমিসংলগ্ন অঞ্চলটি দিয়ে দিচ্ছি; তোমরা আমাদের দেশ ছেড়ে পারস্যে চলে যাও। প্রথমে নিজেরাই সেনা-সমাবেশ করছিল; কিন্তু যখন দেখল যে পরাজয়ের শঙ্কা আছে, তখন এ প্রস্তাব উপস্থাপন করল। হযরত মু'আয বিন জাবাল তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন এবং উঠে চলে আসলেন। রোমানরা সরাসরি হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সাথে কথা বলতে চাইল। এ উদ্দেশ্যে একজন বিশেষ দূত প্রেরণ করল। যখন সেই দূত ইসলামী সেনাশিবিরে এসে উপস্থিত হল তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) মাটিতে বসে ছিলেন আর হাতে তীর ছিল যা তিনি উল্টে-পাল্টে দেখছিলেন। দূত ভেবেছিল ইসলামী সেনাপতি বিশেষ জাঁকজমকপূর্ণ আসনে সমাসীন হবেন, আর সেটিই তাকে চেনার মাধ্যম হবে। কিন্তু সে যেদিকে তাকাচ্ছিল সবাইকে একই রকম দেখতে পাচ্ছিল। অবশেষে কিছুটা অস্বস্তি ও ভীতি নিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের সেনাপতি কে? লোকেরা হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর দিকে ইঙ্গিত করল। সে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, সত্যিই কি তুমি সেনাপতি? হযরত আবু উবায়দা (রা.) বললেন, হ্যাঁ। দূত বলল, আমরা তোমাদের সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে মাথাপিছু ২ আশরাফি (স্বর্ণমুদ্রা) দিব;

তোমরা এখান থেকে চলে যাও। হযরত আবু উবায়দা (রা.) অস্বীকৃতি জানালেন। দূত অসন্তুষ্ট হল এবং উঠে চলে গেল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) তার আচরণ দেখে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুতি নেয়ার আদেশ দিলেন আর সমস্ত পরিস্থিতি হযরত উমর (রা.)-কে লিখে পাঠালেন। হযরত উমর (রা.) আক্রমণ করার অনুমতি দিলেন, কেননা তাদের বিরুদ্ধে রোমান সেনারা জড়ো হচ্ছিল। তিনি (রা.) সাহস জোগালেন যে, দৃঢ়চিত্ত থাক; খোদা তোমাদের সাহায্যকারী হবেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) সেদিনই আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু রোমানরা মোকাবিলার জন্য আসে নি। পরের দিন সকালে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) শুধুমাত্র অশ্বারোহীদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন। রোমান সেনাবাহিনী প্রস্তুত ছিল, উভয়পক্ষের মাঝে যুদ্ধ হল। মুসলমান সেনাবাহিনীর অবিচলতা দেখে রোমান সেনাপ্রধান যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন মনে করল আর ফিরে যেতে চাইল। হযরত খালিদ উচ্চস্বরে বললেন, রোমানরা নিজেদের শক্তি খরচ করে দেখিয়েছে, এখন আমাদের পালা। এর সাথেই মুসলমানরা অকস্মাৎ আক্রমণ করল আর রোমানদের পিছু হটিয়ে দিল। খ্রিষ্টানরা সাহায্যের আশায় যুদ্ধকে প্রলম্বিত করছিল। হযরত খালিদ (রা.) তাদের কৌশল বুঝে ফেললেন। তখন তিনি হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে বললেন, রোমানরা আমাদের ভয়ে ত্রস্ত, এখনই আক্রমণের সময়। তাই তখনই ঘোষণা করা হলো, আগামী দিন আক্রমণ করা হবে, সেনাবাহিনী যেন প্রস্তুত থাকে। রাতের শেষ প্রহরে হযরত আবু উবায়দা (রা.) সেনাবাহিনীকে সারিবদ্ধ করলেন। রোমান সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার। হযরত উমর (রা.)-এর জীবনী লেখকদের মাঝে দু'জন হেয়কেল ও সালাবী এ সংখ্যা আশি হাজার থেকে এক লক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন। যাহোক, এক ঘন্টা ভয়াবহ যুদ্ধ হল। এরপর রোমান সেনাবাহিনীর পা হড়কে যায় আর তারা দিশেহারা হয়ে পলায়ন করল। পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.) নির্দেশ প্রদান করেন যে, সমস্ত দখলকৃত ভূখন্ড তাদের মালিকদের অধীনেই থাকবে। কোন ভূখণ্ড কারও কাছ থেকে নেয়া হবে না এবং মানুষের প্রাণ, ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি এবং উপাসনালয় সবকিছুই সুরক্ষিত থাকবে। শুধুমাত্র মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি নেয়া হবে। যদি কোন জমি নিতে হয় তবে কেবল মসজিদের জন্য নেয়া হবে, অবশিষ্ট জায়গা-জমি তাদের মালিকদের নিকটই থাকবে।

অতঃপর রয়েছে বে'সান বিজয়ের বৃত্তান্ত। ফেহেল যুদ্ধের অবসান হলে শারাহ্‌বিল নিজ সৈন্য-সামন্ত ও আমরকে নিয়ে বে'সান অধিবাসীদের অভিমুখে অগ্রসর হন এবং তাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। সে সময় আবুল আ'ওয়ার ও তার সাথে আরও কতিপয় নেতা তাবারিয়াহ্‌ অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। বে'সান তাবারিয়াহ্‌'র দক্ষিণে ১৮ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি জনপদ। জর্ডানের বিভিন্ন অঞ্চলের মাঝে দামেস্ক এবং পরবর্তী আরও কয়েকটি অভিযানে রোমানদের উপুর্যপুরী পরাজয়ের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। আর লোকজন জেনে গিয়েছিল যে, শারাহ্‌বিল এবং তার সাথে আমর বিন আস, হারেস বিন হিশাম ও সাহল বিন আমর নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে বে'সান দখলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছে। এজন্য সর্বত্র লোকজন দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। শারাহ্‌বিল বে'সান পৌঁছে কয়েকদিন একে অবরোধ করে রাখেন। পরবর্তীতে সেখানকার কিছু লোক লড়াই করার জন্য বের হয়ে আসে। মুসলমনারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের পরাজিত করে, অবশিষ্ট লোকজন সমঝোতার আবেদন করে, যা মুসলমানরা দামেস্ক বিজয়ের জন্য নির্ধারিত শর্তে মেনে নেয়। অর্থাৎ দামেস্ক বিজয়ের মধ্যে যে সকল শর্তাবলী ছিল, সেগুলোর ভিত্তিতে এটিও গৃহীত হয়।

অতঃপর তাবারিয়াহ্ বিজয়ের ঘটনা। যখন তাবরিয়াহ্'র অধিবাসীরা বে'সান বিজয় এবং এর সন্ধি-চুক্তি সম্পর্কে অবগত হয়, তখন তারা আবুল আ'ওয়ারের সাথে এই শর্তে সন্ধি করে যে, তাদেরকে যেন শারাহ্বিলের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। আবুল আ'ওয়ার তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন। অতএব তাবারিয়াহ্ ও বে'সানবাসীদের সাথে দামেস্ক বিজয়ের জন্য নির্ধারিত শর্তে সমঝোতা হয়ে যায় এবং এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় যে, শহর ও এর নিকটবর্তী গ্রামীণ এলাকার সকল ঘর-বাড়ির মধ্যে অর্ধেক মুসলমানদের জন্য খালি করে দেয়া হবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক অংশে স্বয়ং রোমানরা বসবাস করবে ও বাৎসরিক শতকরা এক দিনার এবং কৃষি উৎপাদন হতে নির্দিষ্ট অংশ আদায় করবে। এরপর মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও তাদের সৈন্যবাহিনীরা সেই জনবসতিতে বসতি স্থাপন করে এবং জর্ডানের সন্ধি-চুক্তিও পূর্ণতা লাভ করে এবং সকল সাহায্যকারী সৈন্যবাহিনী জর্ডানের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলে। আর বিজয়ের সুসংবাদ হযরত উমর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করা হয়।

এরপর রয়েছে হিম্স বিজয়। এটি ১৪ হিজরীতে সংঘটিত হয়। এরপর হযরত আবু উবায়দা হিম্সের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন, যা সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ শহর ছিল, যা সামরিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরত্ব বহন করতো। হিম্স, দামেস্ক ও আলেপ্পোর মধ্যে অবস্থিত সিরিয়ার একটি শহর। হিম্সে একটি বড় গির্জা ছিল, যা দর্শনের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসত এবং এখানে উপাসনা করাকে গর্বের বিষয় বলে জ্ঞান করত। যাহোক, হিম্সের নিকটবর্তী অঞ্চলে রোমানরা নিজে থেকেই যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। রোমানরাই সামনে অগ্রসর হয়। অতএব একটি বড় সৈন্যবাহিনী হিম্স থেকে অগ্রসর হয়ে জুসিয়াতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু তারা পরাজিত হয়। হযরত আবু উবায়দা ও হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ হিম্সে পৌঁছে শহর অবরুদ্ধ করে ফেলে। প্রচন্ড শীতকাল ছিল। রোমানরা নিশ্চিত ছিল যে, মুসলমানরা খোলা ময়দানে দীর্ঘক্ষণ লড়াই করতে পারবে না। উপরন্তু হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে সাহায্য লাভেরও আশা ছিল; সে জাযিরা থেকে একটি সৈন্যবাহিনীও প্রেরণ করে। কিন্তু হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, যিনি ইরাক অভিযানের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন, একটি সেনাদল সেই বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যারা সেই সৈন্যবাহিনীকে সেখানেই থামিয়ে দেয়। ঐতিহাসিকগণ লিখেন যে, রোমানদের পায়ে চামড়ার মোজা ছিল, তারপরও তাদের পা শীতে জমে যেত; অথচ সাহাবীদের পায়ে বা মুসলমান সৈন্যবাহিনীর পায়ে সামান্য জুতো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হিরাক্লিয়াস হিমস্বাসীদেরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও তাদেরকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করে স্বয়ং রাওয়াহা চলে যায়। প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেই সেখান থেকে পিঠটান দেয়। হিম্সবাসীরা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে বসে থাকে। যেদিন প্রচণ্ড শীত থাকতো তারা কেবল সেদিনই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হতো। রোমানরা হিরাক্লিয়াসের সাহায্যের অপেক্ষায় ছিল আর চাইতো, শীতের কাছে হার মেনে মুসলমানরা যেন পালিয়ে যায়। কিন্তু মুসলমানরা অবিচলতা দেখিয়েছে এবং হিরাক্লিয়াসের সাহায্যও তারা অর্থাৎ হিমসবাসীরা পায় নি। এদিকে শীতকাল অতিবাহিত হয়ে যায়। তখন হিমসবাসীরা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, এখন এদের সাথে মোকাবেলা করা সম্ভব নয় ফলে, তারা সন্ধির আবেদন করে। মুসলমানরা আবেদন গ্রহণ করে নেয় এবং শহরের সকল দালান-কোঠা শহরবাসীদের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়, আর এদের সাথে দামেস্কের ন্যায় কর ও জিযিয়ার বিনিময়ে সন্ধি করে নেয়া হয়। হযরত আবু উবায়দা হযরত উমর (রা.)-কে পুরো ঘটনা ও বৃত্তান্ত সম্পর্কে অবগত করেন। এর উত্তরে হযরত

উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে নির্দেশনা আসে যে, তুমি এখন সেখানেই অবস্থান কর এবং সিরিয়ার শক্তিধর আরব গোত্রগুলোকে তোমার পতাকাতলে সমবেত কর। আমিও এখান থেকে প্রতিনিয়ত সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরণ করতে থাকবো, ইনশাআল্লাহ।

মারজুর রোম নামে একটি জায়গা রয়েছে। এবছরই মারজুর রোমের ঘটনা ঘটে। মারজুর রোম হলো দামেস্কের নিকটবর্তী একটি স্থান। ঘটনাটি হলো, হযরত আবু উবায়দা ফেহেল থেকে হিমস যাওয়ার জন্য হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের সাথে রওয়ানা হন। যুল কালা' নামক স্থানে সকলে শিবির স্থাপন করে। তাদের এই গতিবিধি সম্পর্কে হিরাক্লিয়াস অবগত হয়ে যায়। এতে সে তুযরা বিতরীক-কে প্রেরণ করে। সে মারজে দামেস্ক এবং এর পশ্চিম দিকে অবস্থান গ্রহণ করে। আবু উবায়দা মারজুর রোম এবং এর সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। তখন মুসলমানদের অবস্থা এমন ছিল যে, শীতকাল এসে পড়েছিল এবং তাদের দেহ ছিল ক্ষতবিক্ষত। তারা যখন মারজুর রোমে পৌঁছে তখন শানস রুমী-ও সেখানে চলে আসে এবং তুযরার নিকটেই অশ্বারোহীদের নিয়ে শিবির স্থাপন করে। এই শানস মূলত তুযরার সাহায্য এবং হিমসবাসীদের রক্ষা করার জন্য এসেছিল। সে এক প্রান্তে নিজ সৈন্যবাহিনীর সাথে অবস্থান নেয়। রাত ঘনিয়ে এলে এদের দ্বিতীয় সেনাপতি তুযরা সেখান থেকে যাত্রা করে আর এরা চলে যাওয়ার কারণে সেই জায়গা খালি হয়ে যায়। তুযরার বিপরীতে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ ছিলেন আর শানসের বিপরীতে হযরত আবু উবায়দা ছিলেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ যখন জানতে পারলেন যে, তুযরা এখান থেকে দামেস্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেও তখন হযরত খালেদ এবং হযরত আবু উবায়দা এ সিদ্ধান্তে একমত হন যে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ তুযরার পশ্চাদ্ধাবন করবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ অশ্বারোহীদের একটি সৈন্যদল নিয়ে সে রাতেই তুযরার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য রওয়ানা হন। এদিকে ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানও তুযরার গতিবিধি সম্পর্কে জেনে গিয়েছিলেন, তাই তিনি তুযরাকে প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে আসেন। উভয় সৈন্যবাহীর মাঝে যুদ্ধ ছিল তুঙ্গে। উভয় দলের মাঝে যখন যুদ্ধ চলছিল ঠিক তখন পেছন থেকে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ তার সৈন্যসহ রণক্ষেত্রে পৌছে যান আর তুযরার পেছন দিক থেকে তিনি আক্রমণ করে বসেন। ফলে লাশের স্তুপ পড়ে যায়, শত্রুরা অগ্রপশ্চাৎ উভয় দিক থেকে মারা পড়ে। মুসলমানরা তাদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়। তাদের মধ্য থেকে কেবল তারাই প্রাণে রক্ষা পেয়েছে যারা পলায়ন করেছে। মুসলমানরা এই যুদ্ধে যেসব যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পেয়েছে সেগুলোতে বাহনের পশু, অস্ত্র, পোশাক প্রভৃতি ছিল। এগুলোকে হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান নিজ সৈন্যবাহিনী ও হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদের সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন। এরপর হযরত ইয়াযিদ দামেস্ক অভিমুখে যাত্রা করেন আর হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ হযরত আবু উবায়দার কাছে ফেরত চলে আসেন। ইসলামের ইতিহাসে যে ইয়াযিদের দুর্নাম রয়েছে সে ছিল মুয়াবিয়ার ছেলে ইয়াযিদ, আর এখানে উল্লেখিত ইয়াযিদ হলো আবু সুফিয়ানের পুত্র। রোমানদের নেতা তুযরাকে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ হত্যা করেছিলেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ যখন তুযরার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য রওয়ানা হন তখন হযরত আবু উবায়দা শানসের মোকাবেলা করেন। উভয় দলের মাঝে মারজুর রোমে যুদ্ধ বেধে যায়। ইসলামী সেনাবাহিনী অনেককে হত্যা করে এবং আবু উবায়দা শানস-কে হত্যা করেন। মারজুর রোম শত্রুদের লাশে ভরে যায়। সেই লাশগুলোর কারণে সেই স্থানটি দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। রোমানদের মধ্যে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা বেঁচে গিয়েছিল,

অবশিষ্ট কেউ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারে নি। মুসলমানরা পলায়নকারীদের হিমস পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করে। এরপর হযরত আবু উবায়দা সেনাবাহিনী নিয়ে হাম্মাদের দিকে রওনা হন। হাম্মাদও সিরিয়ার একটি প্রাচীন শহর যা তৎকালীন দামেস্ক থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। হাম্মাদবাসী তাদের সামনে বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, আত্মসমর্পন করে। শাহযারের অধিবাসীরা যখন জানতে পারল তখন তারাও হাম্মাদবাসীদের ন্যায় সন্ধিচুক্তি করে নিল। শাহযার, হাম্মাদ শহর থেকে অর্ধদিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রাম ছিল। এরপর হযরত আবু উবায়দা সালামিয়া জয় করেন। সালামিয়াও হাম্মাদ থেকে দুই দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি জনপদ ছিল।

এরপর ১৪হিজরিতে লাযেকিয়া বিজিত হয়। ইসলামি সেনাবাহিনী হযরত আবু উবায়দার নেতৃত্বে লাযেকিয়ার দিকে অগ্রসর হয় যা সিরিয়ার একটি শহর এবং সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত, আর হিমসের উপশহর হিসাবে এটিকে গণ্য করা হয়। লাযেকিয়াবাসীরা ইসলামি সেনাবাহিনীকে তাদের দিকে অগ্রসর হতে দেখে দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং শহরের ফটকগুলোকে বন্ধ করে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা নিশ্চিত ছিল যে, মুসলমানরা যদি তাদেরকে অবরোধ করে তাহলে তারা লড়াই করার সামর্থ রাখে, আর ততক্ষণে সমুদ্রপথে তাদের কাছে হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে সাহায্য এসে যাবে। মুসলমানরা এই শহরকে অবরুদ্ধ করে রাখে। প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনার দিক থেকে এই শহরটি অত্যন্ত দৃঢ় ছিল এবং সেনাছাউনির কারণে যথেষ্ট বিখ্যাত ছিল। হযরত আবু উবায়দা একে জয় করার একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করেন, কেননা তিনি রণকৌশলে দক্ষ ছিলেন। তিনি অনুভব করলেন, এটি জয় করা অনেক কঠিন হবে। যদি এটিকে জয়ের জন্য তিনি যদি এখানে শিবির স্থাপন করেন তাহলে সেখানে অবস্থানকাল অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। আর অবরোধ দীর্ঘ হলে হতে পারে যে, শত্রুপক্ষ তাদের কাছে সাহায্যকারী সৈন্য পাঠিয়ে দিবে, ফলে এখান থেকে বিফল হয়ে ফিরে যেতে হতে পারে। অথবা অবরোধ বেশি দীর্ঘ করলে আনতাকিয়া যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। তিনি এক রাতে রণক্ষেত্রে অনেকগুলো এমন গর্ত খনন করান যেগুলোতে অনায়াসে একজন অশ্বারোহী ঘোড়াসহ লুকিয়ে থাকতে পারে। এরপর সেগুলোকে ঘাস দিয়ে ঢেকে দেন এবং সকালে অবরোধ উঠিয়ে হিমসের দিকে যাত্রা করেন। নগরবাসীরা অবরোধ উঠে যেতে দেখে আনন্দিত হয় এবং নিশ্চিন্তে শহরের ফটকগুলো খুলে দেয়। অন্যদিকে হযরত আবু উবায়দা রাতারাতি সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে আসেন এবং সেসব গুহাকৃতির গর্তে লুকিয়ে থাকেন। সকালে যখন তারা শহরের ফটকগুলো খুলে দেয় তখন মুসলমানরা তাদের উপর আক্রমণ করে বসে। কিছু মুসলমান শহরের ফটকের দখল নিয়ে নিল। যারা দুর্গের বাইরে ছিল তারা পলায়ন করাটাই নিজেদের জন্য মঙ্গলজনক বলে মনে করে, আর যারা শহরে ছিল তাদের মাঝে একটি ভীতিকর অবস্থা ছেয়ে যায়। তাই যারা শহরে ছিল তারা সবাই মুক্তির পথ অন্বেষণ করতে লাগল। তাদের জন্য আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং তারা সন্ধিচুক্তি করে নিল এবং পলাতকরা আশ্রয় প্রার্থনা করল। মুসলমানরা শহরে প্রবেশ করে শহর জয় করে নিল। হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ জিযিয়ার বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি করে নিলেন এবং তাদের গির্জা তাদের দায়িত্বেই থাকতে দিলেন। পরবর্তীতে মুসলমানরা এর নিকটেই তাদের একটি মসজিদ নির্মাণ করে নিল। সেই বিজয়ের পর হযরত উমর লিখলেন যে, এ বছর যেন আর অভিযান পরিচালনা করা না হয়।

এরপর রয়েছে কিনেসরিনের বিজয় যা হয়েছে ১৫হিজরি সনে। হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে কিনেসরিন অভিমুখে করেন যা আলেপ্পোর একটি মনোরম শহর ছিল। আলেপ্পোর পথে পাহাড়ের মাঝখানে কিনেসরিনের একটি দুর্গ ছিল। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ হাযের নামক স্থানের কাছে পৌঁছলেন। হাযেরও আলেপ্পোর নিকটবর্তী একটি স্থান। সেখানে রোমানরা মিনাসের নেতৃত্বে তার বিপক্ষে লড়াই করতে আসে। হিরাক্লিয়াসের পর রোমানদের সবচেয়ে বড় সেনাপ্রধান মিনাস-ই ছিল। যাহোক, স্থানীয়রা এবং তাদের সাথে বসবাসকারী আরব খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে।

আরবদের রীতি ছিল যে, তারা শহরের সুরক্ষার জন্য শহরের বাইরে গিয়ে শিবির স্থাপন করত। সুতরাং এই খ্রিষ্টান আরবরাও এই নীতি অনুযায়ী বাইরে ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। প্রচন্ড লড়াইয়ের পর হযরত খালেদ রোমানদের অনেক সৈন্যকে হত্যা করেন এবং তাদের নেতা মিনাসকেও হত্যা করেন। এলাকার লোকেরা খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছে এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা আরব আর আমরা যুদ্ধ করার জন্য সম্মতই ছিলাম না। আমাদেরকে এ যুদ্ধে বাধ্য করা হয়েছে। তাই আমাদেরকে ক্ষমা করা হোক। তখন হযরত খালিদ তাদের অজুহাত মেনে নেন এবং তাদের ওপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকেন। কিছু রোমান পালিয়ে কিনেসরিনের দুর্গে আশ্রয় নেয়। হযরত খালেদ তাদের পিছু নেন, কিন্তু যখন তিনি কিনেসরিন পৌছেন ততক্ষণে রোমানরা শহরের ফটকগুলো বন্ধ করে ফেলেছিল। এটি দেখে হযরত খালেদ তাদের কাছে এই সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তোমরা যদি মেঘে গিয়েও আত্মগোপন কর, তবুও আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবেন অথবা তোমাদেরকে আমাদের কাছে নিক্ষেপ করবেন। কিছুদিন তারা দুর্গেই অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে, কিন্তু অবশেষে কিনেসরিনবাসীরা নিশ্চিত হয়ে যায়, এখন মুক্তির আর কোন উপায় নেই । সুতরাং তারা আবেদন করে, হিমসের অনুরূপ সন্ধিচুক্তির শর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হোক। কিন্তু প্রথমে তারা যে আদেশ অমান্য করেছিল তার প্রেক্ষিতে হযরত খালিদ তাদেরকে আদেশ অমান্যের শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছিলেন। এজন্য হযরত খালেদ শহরকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন বিষয়ে সম্মত ছিলেন না। কিনেসরিনবাসীরা তাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনকে নিয়তির হাতে ছেড়ে আনতাকিয়া পলায়ন করে। হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ কিনেসরিন পৌঁছে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ সঠিক ও ন্যায়সম্মত পেলেন এবং শহরের দুর্গ ও প্রাচীরসমূহ গুঁড়িয়ে দিলেন। এরপর তিনি অনুভব করলেন যে, ন্যায়বিচারের পাশাপাশি দয়ার আচরণও করা উচিত। প্রথমে শত্রুর সাথে যা করা হয়েছে তা ন্যায়বিচার ছিল। এখন মুসলমানদের দয়ার আচরণও করা উচিত। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হয়ে শহরবাসীকে তাদের আবেদন অনুযায়ী নিরাপত্তা দিয়ে দেন এবং এটিও বলা হয় যে, শহরের গির্জা এবং ঘরবাড়ি বণ্টন করে দেয়া হল; অর্ধেক অংশের ওপর মুসলমানরা কর্তৃত্ব নেয় আর অর্ধেক অংশ তাদের কাছেই রেখে দেয়া হয়। এমন একটি বর্ণনাও রয়েছে যে, শহরের কিছু ভূমি নিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং অবশিষ্ট সবকিছু যথারীতি এলাকাবাসীদের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেয়া হয়। যারা আনতাকিয়া পলায়ন করেছিল তারাও জিযিয়া প্রদানের শর্ত গ্রহণ করে ফিরে এসেছিল। অন্যান্য বিজিত এলাকার ন্যায় এখানকার লোকদের সাথেও উত্তম আচরণ করা হয়েছে এবং সঠিক সাম্যের ভিত্তিতে তাদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে কোন ক্ষমতাধর কোন দুর্বলের ওপর অত্যাচার-অনাচার করতে পারত না।

এরপর রয়েছে কায়সারিয়া বিজয়। এটিও ১৫ হিজরি সনে সংঘটিত হয়। কায়সারিয়া সিরিয়ার সমুদ্রতীরবর্তী শহর যা তাবারিয়া থেকে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত। এই যুদ্ধ কোন বছরে হয়েছে এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। একটি হল, ১৫হিজরি সনে, অন্য বক্তব্য অনুযায়ী ১৬হিজরিতে সংঘটিত হয়েছে, আর তৃতীয় একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী ১৯হিজরি এবং চতুর্থ বর্ণনানুযায়ী ২০হিজরি সনে সংঘটিত হয়েছে। যাহোক, যখন হযরত আবু উবায়দা বিজয়াভিযান নিয়ে উত্তর রোমে অগ্রসর হচ্ছিলেন, হযরত আমর বিন আস এবং হযরত শারাহবিল বিন হাসানা রোমের সেই সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছিলেন যারা ফিলিস্তিনে একত্রিত ছিল এবং তাদেরকে পরাজিত করার জন্য চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু এটি কোন সহজ কাজ ছিল না। এই সৈন্যবাহিনী সংখ্যা এবং অস্ত্রশস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক শক্তিশালী ছিল এবং তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল রোমের সবচেয়ে বড় সেনাপতি আতরাবুন, যার দূরদৃষ্টি এবং সামরিক বুৎপত্তির ক্ষেত্রে সেই রাজত্বে তার কোন জুড়ি ছিল না। সে সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেয়ার কথা ভাবল যেন নেতৃত্বের লাগাম একমাত্র তার হাতেই থাকে । আর যদি তার সেনাবাহিনীর কোন অংশের উপর আরবরা জয়ীও হয় সেক্ষেত্রে যেন অন্য অংশ প্রভাবিত না হয়। সুতরাং সে রামাল্লা এবং অনুরূপভাবে এলিয়ায় একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিযুক্ত করে এবং এদের সাহায্যের জন্য গাযা, সাবাস্তিয়া, নাবলুস, লুদ ও ইয়াফায় সেনা মোতায়েন করে। এরপর আরবদের আগমনের অপেক্ষায় থাকে। তার বিশ্বাস ছিল সে আরবদের পরাজিত এবং তাদের শক্তি ধুলিস্যাৎ করার শক্তি ও ক্ষমতা রাখে। হযরত আমর বিন আস (রা.) পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা অনুভব করেন। তিনি চিন্তা করেন, তিনি যদি তার সমস্ত সেনাদল নিয়ে আতরাবুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন তাহলে রোমান সৈন্যরা একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারবেন না, বরং হতে পারে রোমনরাই তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হবে। অতএব হযরত উমর (রা.) কে তিনি পত্র লিখলে তিনি (রা.) ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে নির্দেশ দেন, আপনার ভাই মুয়াবিয়াকে আপনি কায়সারিয়া বিজয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করুন যেন আতরাবুনের কাছে সমুদ্রপথে সাহায্য পৌঁছতে না পারে। হযরত উমর (রা.) আমীর মুয়াবিয়ার নামে প্রেরিত পত্রে লিখেন, আমি আপনাকে কায়সারিয়ার আমীর নিযুক্ত করছি। সেখানে যান এবং তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করুন আর **'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আল্লাহু রাব্বুনা ওয়া সিকাতুনা ওয়া রিজাউনা ওয়া মওলানা। নে'মাল মওলা ওয়া নে'মান্ নাসীর'** অজস্র ধারায় পড়তে থাকুন। অর্থাৎ পাপ থেকে বাঁচার এবং পুণ্যকর্ম করার ক্ষমতা কেবল আল্লাহ্ তা'লাই দান করেন, যিনি অতীব উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং অতীব মহান। আর আল্লাহ্ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক, নির্ভরস্থল, আমাদের ভরসাস্থল এবং তিনিই আমাদের অভিভাবক; কতইনা উত্তম অভিভাবক আর কতইনা উত্তম সাহায্যকারী।

আল ফারুক পুস্তকে লিখা রয়েছে, হযরত আমর বিন আস (রা.) ১৩ হিজরীতে প্রথমবার কায়সারিয়ার ওপর অভিযান পরিচালনা করেন এবং অনেক দিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখেন কিন্তু বিজয় লাভ করা সম্ভব হয় নি। আবু উবায়দা (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা.) ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে তার স্থলে নিযুক্ত করেন এবং কায়সারিয়ার অভিযানে বের হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি ১৭ হাজার সৈন্য সাথে নিয়ে যাত্রা করেন এবং সেখানে গিয়ে শহর অবরোধ করেন। কিন্তু ১৮ হিজরী সনে অসুস্থ হলে তিনি তার ভাই আমীর মুয়াবিয়াকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে দামেস্কে চলে আসেন আর সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

কায়সারিয়া লেভানটাইন সাগরের উপকূলে অবস্থিত আর (একে) ফিলিস্তিনের অঞ্চলগুলোর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। বর্তমানে এটি বিরান পড়ে আছে, কিন্তু সেই যুগে অনেক বড় শহর ছিল। বালাযারীর ভাষ্যমতে এখানে ৩০০ বাজার ছিল, যার প্রতিরক্ষায় অনেক বড় একটি রোমান সেনাদল নিযুক্ত ছিল। এখানে তাদের একটি অত্যন্ত মজবুত ও ভয়ঙ্কর সীমান্তবর্তী দুর্গ ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কায়সারিয়ায় পৌঁছার পর একে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। রোমানরা ইসলামী সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ করতো, কিন্তু পরাস্ত হয়ে তাদের আবার দুর্গে ফিরে যেত। অবশেষে অবরোধ দীর্ঘ হয়ে গেলে একদিন তারা 'হয় মারব না হয় মরব'– এমন পণ করে বেরিয়ে আসে, কিন্তু পরাজয় বরণ করে আর এত মারাত্মকভাবে পরাজয় বরণ করে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের ৮০ হাজার সৈন্য মারা যায়। পরাজয় ও পলায়নের পর এ সংখ্যা এক লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। কায়সারিয়া বিজয় এবং এর সেনাদলের ধ্বংসের পর মুসলমানরা সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হয়ে যায় আর সেদিক থেকে রোমানদের সাহায্য আসা বন্ধ হয়ে যায়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশের সাথে বিজয়ের সংবাদ হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে প্রেরণ করেন। অন্য আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) ব্যাপক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অবরোধ করেন। শহরের অধিবাসীরা বেশ কয়েকবার দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করে, কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হয়; তথাপি শহরের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। একদিন ইউসুফ নামের এক ইহুদি আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিকট এসে একটি সুড়ঙ্গের সন্ধান দেয় যা শহরের ভেতর দিয়ে দুর্গের দরজা পর্যন্ত গিয়েছিল। অতএব কিছু সংখ্যক সাহসী যোদ্ধা এই পথ ধরে দুর্গের ভিতর গিয়ে দরজা খুলে দেয় এবং একই সাথে পুরো সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে আর বিজয় অর্জিত হয়।

হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.) যিনি বদরী সাহাবীদের মাঝে অন্যতম, তিনিও এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কায়সারিয়ার যুদ্ধে তাঁর বীরত্বের ঘটনা এভাবে পাওয়া যায় যে, কায়সারিয়ার অবরুদ্ধ অঞ্চলে হযরত উবাদা বিন সামেত ইসলামী সেনাবাহিনীর ডান পার্শ্বের নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি তাঁর সেনাদলকে উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে তাদেরকে পাপ থেকে বিরত থাকার এবং আত্মবিশ্লেষণের নির্দেশ দেন। এরপর তিনি পুনরায় সৈন্যদের একটি দল নিয়ে সামনে অগ্রসর হন এবং অনেক রোমান সৈন্যকে হত্যা করেন। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্যে তিনি সম্পূর্ণ সফল হতে পারেন নি। তাই পুনরায় নিজের জায়গায় ফিরে আসেন এবং নিজ সাথীদের প্রাণপণ যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেন ও নিজের সাথে এত বড় সেনাদল নিয়ে আক্রমণ করা সত্ত্বেও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফেরার কারণে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, হে ইসলামের সুরক্ষাকারীগণ! আমি আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণকারী নকীবদের (নেতাদের) মধ্যে সবচেয়ে স্বল্পবয়স্ক ছিলাম, কিন্তু আমি সবচেয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করেছি। আল্লাহ্ আমার অনুকূলে সিদ্ধান্ত করেছেন আর আমাকে জীবিত রেখেছেন, যার সুবাদে আজ আমি তোমাদের সাথে এসব শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যখনই আমি মু'মিনদের দল নিয়ে মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করেছি তখন তারা আমাদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র খালি করে দিয়েছে; অর্থাৎ আমরা বিজয়ী হয়েছি আর তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ আমাদের জয়যুক্ত করেছেন। কিন্তু আজ কী হলো যে, তাদের ওপর আক্রমণ করা সত্ত্বেও তাদেরকে তোমরা পিছু হটাতে পার নি? অতএব এর কারণ সম্পর্কে তার যে আশংকা ছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, তোমাদের সম্পর্কে আমি দুটি বিষয়ের আশংকা করছি; হয় তোমাদের মাঝে কোন বিশ্বাসঘাতক রয়েছে অথবা আক্রমণের

সময় তোমরা নিষ্ঠাবান ছিলে না। হয় তোমরা বিশ্বাসঘাতকত, নতুবা তোমাদের নিষ্ঠা নেই কিংবা তাদের ওপর তোমরা যখন আক্রমণ করেছিলে তখন (তোমাদের মাঝে) নিষ্ঠা ছিল না। এরপর তিনি তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে শাহাদাত কামনার নির্দেশ দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের সর্বাগ্রে থাকব এবং কখনোই পিছু হটব না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লা বিজয় অথবা শাহাদাতের মৃত্যু দান করেন। অতএব মুসলমান এবং রোমানদের মাঝে যুদ্ধ শুরু হলে উবাদা বিন সামেত তাঁর ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পদাতিক (যোদ্ধা) হয়ে যান। তাকে পদাতিক অবস্থায় দেখে উমায়ের বিন সা'দ আনসারী সেনাপতির পদাতিক যুদ্ধের সংবাদ মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে বলেন, সবাই যেন তার রীতি অনুসরণ করে। অতএব রোমানদের বিরুদ্ধে সবাই তুমুল যুদ্ধ করে তাদের পিছু হটতে বাধ্য করে। অবশেষে তারা পালিয়ে গিয়ে শহরের দুর্গে আশ্রয় নেয়। আরবরা যেভাবে কায়সারিয়া জয় করেছিল সেভাবে গাজাও জয় করে নেয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতকালেও একবার মুসলমানরা গাজার দখল নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা হয়। এই দু'টি সীমান্তবর্তী অঞ্চল যখন মুসলমানদের করতলগত হয় তখন হযরত আমর বিন আস (রা.) সমুদ্রের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

এসব ঘটনার উল্লেখ অব্যাহত থাকবে। এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই আর জুমুআর নামাযের পর তাদের জানাযাও পড়াব।

প্রথম স্মৃতিচারণ হলো কেরালার সাবেক মোবাল্লেগ জনাব কে মুহাম্মদ আলভী সাহেবের সহধর্মিনী শ্রদ্ধেয়া খাদিজা সাহেবার, যিনি কিছুদিন পূর্বে তিনি ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পিতা কেহ্নী মহিউদ্দিন সাহেব কেরালার প্রাথমিক আহমদীদের একজন ছিলেন। মরহুমাও খুবই অল্প বয়সে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। অত্যন্ত ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞতাপরায়ণ, নিয়মিত নামায ও রোযা পালনকারী, ধার্মিক, দরিদ্র হিতৈষী, অতিথিপরায়ণ এবং স্বল্পে-তুষ্ট মহিলা ছিলেন। মরহুমার স্বামী জামা'তের মোবাল্লেগ ছিলেন, জামা'তী সফরের কারণে তিনি দিনের পর দিন বাইরে থাকতেন; কিন্তু মরহুমা সর্বদা কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং কোন ধরনের অভিযোগ-অনুযোগ করেন নি। তিনি তার অবর্তমানে দুই ছেলে এবং পাঁচ মেয়ে রয়েছে। মরহুমা ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তার বড় ছেলে কে মাহমুদ সাহেবও জামা'তের মোবাল্লেগ ছিলেন যিনি ৫৪ বছর বয়সে কিডনী অকেজো হওয়ার ফলে মৃত্যুবরণ করেন। তার ছোট ছেলেও জামা'তের মোয়াল্লেম এবং পাঁচ মেয়েরই বিয়ে হয়েছে মুরব্বীদের সাথে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো কোট ফতেহ্ খানের মালেক সুলতান রশীদ খান সাহেবের, যিনি আটক জেলার প্রাক্তন জেলা আমীর ছিলেন। মালেক সুলতান রশীদ খান সাহেব ২২ ও ২৩ আগস্টের মধ্যবর্তী রাতে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মুসী (ওসীয়্যতকারী) ছিলেন। তার পিতা কর্ণেল মালেক সুলতান মুহাম্মদ খান সাহেব ১৯২৩ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। তিনি পরিবারে একমাত্র আহমদী ছিলেন। এরপর তার বিয়ে হয় আয়েশা সিদ্দীকা সাহেবার সাথে, যিনি চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সাইয়াল সাহেবের কন্যা ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ই এই বিয়ে করিয়েছিলেন। মালেক সুলতান রশীদ সাহেবের দাদার নাম ছিল মালেক সুলতান সুর্খরু খান, তিনি বৃটিশ সরকারের দরবারে বিশেষ মর্যাদার

অধিকারী ছিলেন; দরবারে তাকে (বসার জন্য) আসন দেয়া হতো। তিনি নিজ পুত্র মালেক সুলতান মুহাম্মদ খান সাহেবের চার বছর পর আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মালেক সুলতান রশীদ খান সাহেবের জামা'তী কার্যক্রমের বিবরণ হলো ৯৬ থেকে ৯৯ সাল পর্যন্ত এবং এরপর ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত আটক জেলার জেলা আমীর হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মৃত্যুকালেও তিনি কোট ফতেহ্ খান জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর মীর মুহাম্মদ খান সাহেবের তিনি আত্মীয় ছিলেন; কিন্তু সেটি পার্থিবতায় নিমগ্ন পরিবার ছিল। অথচ তার পিতা আহমদী হওয়ার পর সম্পূর্ণরূপে পার্থিবতা ত্যাগ না করলেও ধর্মকে প্রাধান্য দানকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর এই একই বৈশিষ্ট্য ছিল মালেক সুলতান রশীদ খান সাহেবের মাঝেও। তিনি প্রথমদিকে এক দশমাংশের ওসীয়্যত করেন, পরবর্তীতে এক সপ্তমাংশ ওসীয়্যত করেন, এরপর হিস্যায়ে জায়েদাদ (সম্পত্তির ওসীয়্যতকৃত অংশ)ও পরিশোধ করে দেন। আমার ধারণা, সম্ভবত সম্পত্তির এক দশমাংশের ওসীয়্যত ছিল আর আয়ের ওপর এক সপ্তমাংশের ওসীয়্যত ছিল। তার বোন রাশেদা সাইয়াল সাহেবা বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) একবার আমাকে লিখেছিলেন, তোমার পিতা আহমদীয়াতের জন্য এক নগ্ন তরবারি ছিলেন আর তোমার ভাইদের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এরপর তিনি মালেক রশীদ সাহেব সম্পর্কে বলেন, খিলাফতের সাথে আমার ভাইয়ের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল, খলীফাতুল মসীহ্র প্রতিটি নির্দেশ তৎক্ষণাৎ পালন করতেন। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপায় তিনি খিলাফতের আস্থাভাজন সেবক ছিলেন এবং পরিপূর্ণ একাগ্রতার সাথে জামা'তী দায়িত্ব পালন করেছেন। আধ্যাত্মিকতাও তার মাঝে কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। কেউ তাকে দেখলে অনুভব করতো যে, এই পার্থিব জীবনের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজের সম্পর্কের বিষয়ে বেশি কথা বলতেন না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। দিনরাত সব সময় প্রত্যেকের জন্য দোয়ায় নিমগ্ন থাকতেন, তারা বন্ধু হোক বা আত্মীয় হোক কিংবা অপরিচিত কেউ। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন বা অনাত্মীয়দের মধ্য থেকে এমন একজনও নেই যে কখনো তার দুয়ার থেকে খালিহাতে ফিরে গিয়েছে। বেশ কয়েক ব্যাক্তি তার বদান্যতার অন্যায় সুযোগও নিয়েছে। কাউকেই তিনি 'না' বলতে পারতেন না। তিনি বলেন, আমার ভাতিজির কাছে এক মহিলা এসে বলে, সেই অভাবী পরিবারগুলোর কী হবে, যেখানে কেবল সুলতান রশীদ সাহেবের পয়সায় চুলা জ্বলতো? অর্থাৎ সুলতান রশীদ সাহেবের সাহায্যে তাদের দিনাতিপাত হতো। তিনি কতটা বদান্যতা প্রদর্শন করতেন তার প্রকৃত ধারনা আমাদের নেই। আমার ভাতিজি একদিন তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি যে মানুষের এত উপকার করেন, মানুষ কি এগুলোর মূল্যায়ন করবে বা মনে রাখবে? তখন তিনি বলেন, হয়তো আমাকে মনে রাখবে না, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন। তার আরেক বোন নাঈমা সাহেবা বলেন, আমার ভাইয়ের মাঝে তবলীগ করার খুব গভীর উদ্দীপনা ছিল, তিনি বেশ কয়েকজন পুণ্যাত্মার হেদায়েত লাভের কারণ হয়েছেন। প্রত্যেক সাক্ষাৎকারীর সাথে তবলীগের সুযোগ বের করে নিতেন। অ-আহমদী বন্ধুরা প্রায়শ সন্ধ্যায় চলে আসতো আর ঘন্টার পর ঘন্টা ওফাতে মসীহ্-র বিষয়ে বিতর্ক হতো, অথচ এতে বিপদের শংকাও ছিল। ইবাদতে তার আনন্দ ও আগ্রহেরও চিত্র ছিল অভাবনীয়। সাধারণত ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে একাকী- সঙ্গোপনে নিজ প্রভুর সাথে কথা বলতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে সত্যস্বপ্ন এবং দিব্যদর্শন দ্বারাও সম্মানিত করেছেন। একবার অ্যাবোটাবাদে

গ্রীষ্মের ছুটিতে যান। হঠাৎ সেখানে একটি আর্থিক সমস্যায় নিপতিত হন। দোয়া ছাড়া কিছুই করার সামর্থ ছিল না। তিনি বলেন, সকালে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বৃক্ষবহুল একটি জায়গার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি উঁচু ও স্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসে যে, **লা তাকনাতু মির্ রাহমাতিল্লাহ্** (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না।)

আটক জেলার প্রাক্তন আমীর যুবায়রী সাহেবের স্ত্রী তার বোনকে বলেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুগে জেলার মিটিংয়ের জন্য (মরহুম) যখন তার বাসায় অবস্থানরত ছিলেন, তখন তার চেহারায় কিছুটা উদ্বিগ্নতা ছিল। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, একটি বক্তৃতা করতে হবে, কিন্তু প্রস্তুতি মোটেই নেয়া সম্ভব হয়নি। পরবর্তী দিন সকালে বেশ উৎফুল্ল ছিলেন। নাশতার জন্য এসে বলেন, রাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) স্বপ্নে আসেন আর পুরো বক্তৃতা কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি লিখিয়ে দিয়েছেন; আলহামদুলিল্লাহ্, আমার বক্তৃতা তৈরি হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি এতটা অগাধ ভরসা ছিল যে গ্রামে শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় একাকী পরম প্রশান্তির সাথে বছরের পর বছর জীবন অতিবাহিত করেছেন, কোন ভয় বা উৎকণ্ঠা ছিল না। অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তিনি বলতেন, খোদার নির্দেশ ছাড়া গাছের পাতাও নড়তে পারে না। একবার তার এক কর্মচারী কোন সাহায্যপ্রার্থীকে ফিরিয়ে দিতে চাইলে তাকে বুঝান যে, আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাকে কারো জন্য উসিলা (মাধ্যম) বানাতে চান তাহলে তাকে ফিরিয়ে দেয়ার আমি কে? সকল প্রকার জ্ঞানগর্ভ আলোচনার দক্ষতা রাখতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী কয়েকবার অধ্যয়ন করেছিলেন। মাশাআল্লাহ্, যাবতীয় উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের আধার ছিলেন। নামায-রোযা পালনকারী, তাহাজ্জুদ আদায়কারী, দোয়াকারী আর একান্ত প্রজ্ঞাসূচক ভঙ্গিমায় কথা বলার দক্ষতা রাখতেন। সকল আলাপ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তবলীগে নিয়ে শেষ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো ইন্দোনেশিয়ার মোকাররম আব্দুল কাইয়্যুম সাহেবের। গত ২৫ আগস্ট তারিখে ৮২ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি মরহুম মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সুমাত্রী সাহেবের পুত্র ছিলেন, যিনি পাক-ভারতের বাইরের (কোন জাতি হতে) প্রথম মুবাল্লিগ ছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রসিদ্ধ টেকনিক্যাল স্কুল থেকে তিনি কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর সরকারী স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য ফ্রান্স গমন করেন এবং পেট্রোলিয়াম ইকোনোমিকস বিষয়ে সেখানে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে চাকরি নেন। সেখানে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। অবসরগ্রহণ সত্ত্বেও নিজ কর্মক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাকে কাজে লাগানো হতো। এরপর ৭৩ বছর বয়সে অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে তিনি ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি দেশের জন্যও অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পাদন করেছেন। ৭৩ সনে তিনি সরকারের কাছে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পর্কে একটি ফর্মূলা প্রস্তাব করেন আর তখন থেকে নিয়ে অর্থাৎ ১৯৭৪ সন থেকে নিয়ে ২০০০ সন পর্যন্ত এর কারণে সরকারের ১১০ বিলিয়ন ডলার লাভ হয়েছে। যাহোক, একজন আহমদী সকল স্থানে দেশ ও জাতির সেবা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়াতেও মোল্লাদের প্রভাবে কিছু কিছু এলাকায় আহমদীয়াতের বিরোধিতা অনেক বেড়ে যায়, তা সত্ত্বেও আমাদের কাজ হলো দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। তিনি আমলা হিসেবে দেশীয় সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ

করেছেন। ২০০৫ সনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদক লাভ করেছেন, যা ইন্দোনেশিয়ান সরকার বেসামরিক লোকদেরকে অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য সেবাকর্মের জন্য প্রদান করে থাকে। আর জাতির মহান সেবকদেরকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট কবরস্থানে সামরিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সমাধিস্থ করা হয়। যাইহোক, মরহুম যেহেতু সেখানে সমাহিত হবেন না, তাই তার মৃত্যুপরবর্তী সামরিক অনুষ্ঠানটি পারুং-এ মূসীয়ানদের কবরস্থানে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে তাকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। অত্যন্ত অমায়িক ছিলেন, নিজের ভাইবোনদের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। তার পিতার উপদেশ ছিল, তিনি যেন তার ভাইবোনদের দেখা-শুনা করেন, আর সর্বদা তিনি তা পালন করেছেন। মুরব্বী ও ওয়াকফে যিন্দেগীদের সাথে অত্যন্ত সশ্রদ্ধ ও সম্মানপূর্ণ ব্যবহার করতেন। তার ছোট ভাই বাসেত সাহেব জামাতের মুবাল্লিগ এবং ইন্দোনেশিয়া জামা'তের আমীর। অধীনস্তদের সাথেও তার ব্যবহার খুবই ভালো ছিল। তার এক অধীনস্ত বলেন, নয় বছর বয়স থেকে মরহুম আমার ভরণপোষণ করেছেন। স্কুলের ফিস ইত্যাদি মরহুমই মেটাতেন। তার উত্তম ব্যবহারের কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইপুস্তক পাঠের পর আমিও বয়আত করে নিই। মরহুমের দয়া ও উদারতা ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের। মানুষের সাথে সর্বদা সমান ব্যবহার করতেন। কখনো নিজকে নিয়ে অহংকার করেন নি আর নিজের পদের জন্যও অহংকার করেন নি। সরকারী গ্যাস কোম্পানিতে তার প্রাক্তন এক সহকর্মী বলেন, তিনি খুবই মেধাবী, অবিচল ও পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি খুবই সুখ্যাত ও বড় কর্মকর্তা ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও খুবই বিনয়ী ছিলেন। খিলাফত ও জামা'তের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। যখনই জামা'তের কুরবানীর প্রয়োজন হতো, কিংবা বিপদের মোকাবিলা করতে হতো, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সাহায্য করতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) যখন ইন্দোনেশিয়া যান তখন তিনি তার ঘরেই অবস্থান করেছিলেন। সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি করতে গিয়ে মরহুম কখনো নিজের আহমদী হওয়ার বিষয়টি গোপন করেন নি, কিংবা পরবর্তীতেও নয়; অথচ বিরোধিতা পরবর্তীতে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু নিজের আহমদী পরিচয় তিনি কখনো গোপন করেন নি। নিজ বন্ধুদের তবলীগ করার বিষয়ে তৎপর ছিলেন আর একজন সুপরিচিত আহমদী ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুখ্যাত ছিলেন। একবার এক বিদ্যুৎ কোম্পানীর সি.ই.ও. মন্ত্রীকে বলেন, বাঁধের পানি হ্রাস পাচ্ছে, আর কিছুদিন এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে। মন্ত্রী সাহেবের তার (অর্থাৎ মরহুমের) দোয়ার প্রতি আস্থা ছিল; তিনি বলেন, তুমি কাইয়্যুম সাহেবের কাছে যাও। তখন সেই ব্যক্তি কাইয়্যুম সাহেবের কাছে এসে বলেন, আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বলেন, আমার সাহায্য যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে আমার মাধ্যমে তুমি আমাদের ইমাম খলীফাতুল মসীহ্কে পত্র লিখ। এরপর তিনি এই চিঠি লিখেন যে, দোয়া করুন যেন এই কাজ হয়ে যায়। তিনি বলেন, মঙ্গলবার তিনি এই চিঠি লিখেন আর পরের দিনই মুষলধারে বৃষ্টি হয় ও বাঁধ পানিতে পূর্ণ হয়ে যায় । জামা'তের জন্য তার সেবাসমূহ হলো, পারুং-এ হেডকোয়ার্টার কমপ্লেক্স নির্মাণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তৎকালীন মুবাল্লিগ ইনচার্জ মাহমুদ চিমা সাহেব তাকে জানালে তিনি বলেন, কোন চিন্তা করবেন না। আর্থিক দিক থেকে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল বা অর্থ সংকট ছিল। তিনি বলেন, পুরো খরচ আমি বহন করব, আর তা-ই করেছেন। দুই বছরের মধ্যে একটি বড় মসজিদ সেখানে নির্মিত হয়। কেন্দ্রীয় গেস্টহাউজ ও মুবাল্লিগদের কোয়ার্টার নির্মাণের বেশিরভাগ ব্যয়ভার তিনিই বহন করেন। চারটি কোয়ার্টার এর শতভাগ নির্মাণ খরচ

মরহুমের পক্ষ থেকে বহন করা হয়েছে। এম.টি.এ. ইন্দোনেশিয়ার প্রাথমিক দিনগুলোতে প্রায় সকল খরচ মরহুম ও তার স্ত্রী বহন করেছেন। পশ্চিম জাকার্তায় অবস্থিত তার ঘরকেই স্টুডিও হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কর্মীদের ভাতাও মরহুমের পক্ষ থেকে আদায় হতো। ইন্দোনেশিয়ায় প্রাথমিক দিনগুলোতে হোমিওপ্যাথির ঔষধ থেকে নিয়ে ক্লিনিক এর জায়গা পর্যন্ত যাবতীয় ব্যয় মরহুমের পরিবার বহন করেছে। ওয়াহেদ সিনিয়র হাইস্কুলের সূচনালগ্নের নির্মাণব্যয়ও মরহুমের পরিবারের পক্ষ থেকে দানকৃত অর্থে নির্বাহ করা হয়েছে; এর বেশিরভাগ অংশও তারই হতো। কাদিয়ানে নির্মাণাধীন ইন্দোনেশিয়ান গেস্টহাউজ **'সারায়ে আইয়্যুব'** এর জন্যও তিনি উল্লেখযোগ্য আর্থিক কুরবানী করেছেন। মরহুম কেন্দ্রের নিকটে অনেক জমি ক্রয় করেছেন এবং পরবর্তীতে আবাসনের জন্য তা জামা'তকে দান করেন। জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়ার প্রিন্সিপাল মাসুম আহমদ সাহেব লিখেন, কখনো কখনো আমেলার মিটিংয়ে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যেতো। কিন্তু তার ছোট ভাই অর্থাৎ আমীর সাহেব যখন বলতেন- এ বিষয়টি এখন শেষ করুন, তিনি তৎক্ষণাৎ নিশ্চুপ হয়ে যেতেন এবং আর কোন মতামত ব্যক্ত করতেন না। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো বেনিনের দাউদা রায্যাকি ইউনুস সাহেবের, যিনি গত ২৭ আগস্ট তারিখে ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম বেনিনের প্রাথমিক আহমদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নিজ পরিবারে একাই আহমদী ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তার বড় ভাই মরহুম যিকরুল্লাহ্ দাউদ সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, যিনি বেনিনের সর্বপ্রথম আহমদী ছিলেন। তার স্ত্রী-সন্তানেরা আহমদী নয়, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও (আহমদীয়াত গ্রহণের) তৌফিক দিন। আমীর এবং মুবাল্লিগ ইনচার্জ মিয়াঁ ক্বমর আহমদ সাহেব লিখেন, তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে আমাকে তার আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা শোনান। তিনি বলেন, আমার বড় ভাই যিকরুল্লাহ্ দাউদ, যিনি ইতোমধ্যে নাইজেরিয়াতে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন, তার আহমদীয়াত গ্রহণের কথা যখন আমি জানতে পারি আর একই সাথে লোকমুখে আহমদীয়াত সম্পর্কে নানান কথা শুনি তখন আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই। আমি তার হাতে **আলাইসাল্লাহু** আংটি পরা দেখে তৎক্ষণাৎ আমার বড় ভাইকে জিজ্ঞেস করি, এটি কীসের আংটি পরে আছেন আর আপনাদের ধর্মে এর মর্যাদা কী? তিনি বলেন, এর ওপর পবিত্র কুরআনের আয়াত লেখা আছে যার অর্থ হলো, আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? আর আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি আমার ভাইকে জিজ্ঞেস করি যে, আহমদীয়াত কি ইসলাম থেকে ভিন্ন কোন ধর্ম? তিনি বলেন, তোমরা যে ইমামের জন্য অপেক্ষা করছ, আমাদের ভাষ্য হলো- তিনি চলে এসেছেন আর এটিই প্রকৃত ইসলাম। তিনি বলেন, একথা শুনে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইপুস্তক অধ্যয়ন করি আর **'ইসলামী নীতি-দর্শন'** পুস্তকটি পড়ে আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেই। তিনি বেনিনের শিক্ষিত লোকদের মাঝে গণ্য হতেন। তিনি ফ্রান্স থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে মাস্টার্স করেছেন। বেনিনের বিদ্যুত ও পানি অধিদপ্তরের ন্যাশনাল ডিরেক্টর পদে থাকাকালীন অবসর গ্রহণ করেন। অনেক প্রভাবশালী, শ্মশ্রুধারী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। নিয়মিত নামায আদায়কারী, তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত, একজন পুণ্যবান ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাদের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল।

তাঁদের পুস্তকাবলী অধ্যয়ন ছিল তার দৈনন্দিন অভ্যাস। জামা'তের অনেক দায়িত্বে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন আর বেনিন জামা'তের জন্য তার অনেক অবদান রয়েছে। হিউম্যানিটি ফার্স্ট বেনিনের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন। মেডিকেল ক্যাম্প ইত্যাদির আয়োজন করতেন এবং নিজে ডাক্তারদের সাথে গিয়ে সারাদিন না খেয়ে মানবসেবায় রত থাকতেন।

ডা. ক্বমর আহমদ আলী সাহেব বলেন, আমি বেনিনে ডাক্তার হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। তিনি বলেন, মেডিকেল ক্যাম্প চলাকালীন সময়ে ক্লান্তি থাকলেও কিংবা সফরের কারণে দেরিতে ঘুমালেও সবসময় আমি তাকে রাতে দীর্ঘ সময় ধরে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে করতে দেখেছি। যখনই চোখ খুলেছে তাকে তাহাজ্জুদ পড়তে দেখেছি। যখন কোন বক্তৃতা করতেন তখন অত্যন্ত আবেগের সাথে বয়আতের শর্তাবলীর ওপর আমল করার উপদেশ দিতেন। মুবাল্লিগ সিলসিলাহ মোজাফফর আহমদ জাফর সাহেব বলেন, যখনই কোন বক্তৃতা করতেন অত্যন্ত আবেগের সাথে বয়আতের শর্তাবলীর ওপর আমল করার উপর গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি বলেন, (মরহুম) আমাকে বলতেন, প্রত্যেক আহমদী যতক্ষণ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহাম **আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আবদাহু** না বুঝবে সে জগতপূজারীই থেকে যাবে।

আমীর সাহেব আরো লিখেন, ২০০৬ সালে তিনি ৩০ একর আয়তনের একটি জমি জামা'তকে দান করেন। ২০২১ সালে আমি তার কাছে এ ইচ্ছা ব্যক্ত করি যে, বেনিনে মাদ্রাসাতুল হিফজের জন্য একটি ভবন নির্মাণ করে জামা'তকে উপহার দিন। এতে তিনি মুচকি হেসে বলেন, ইনশাআল্লাহ্। আর এটির নির্মাণ কাজ আরম্ভও হয়ে গেছে। সবসময় বলতেন যে, জামা'তের শিশুরা যদি পড়ালেখা শিখে ফেলে তাহলে বেনিন জামা'ত আফ্রিকার বড় জামা'তগুলোর অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি শিশুদেরকে জামা'তের মূল্যবান বইপুস্তক পুরস্কার হিসেবে দিতেন। 'বায়তুল ইকরাম' এতিমখানায় গেলে সেখানকার ইনচার্জ ডা. ওয়ালীদ সাহেবকে উপদেশ দেন যে, এই শিশুদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন, কেননা এরা আমাদের জামা'ত এবং জাতির সন্তান আর আমরা সবাই এই শিশুদের পিতামাতা, সেইসাথে তাদের জন্য দোয়াও করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তাদের সবার মর্যাদা উন্নীত করুন।

আমি যেমনটি বলেছি, নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা আদায় করব।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)